স্পট

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ২৩ একর জমি দখল

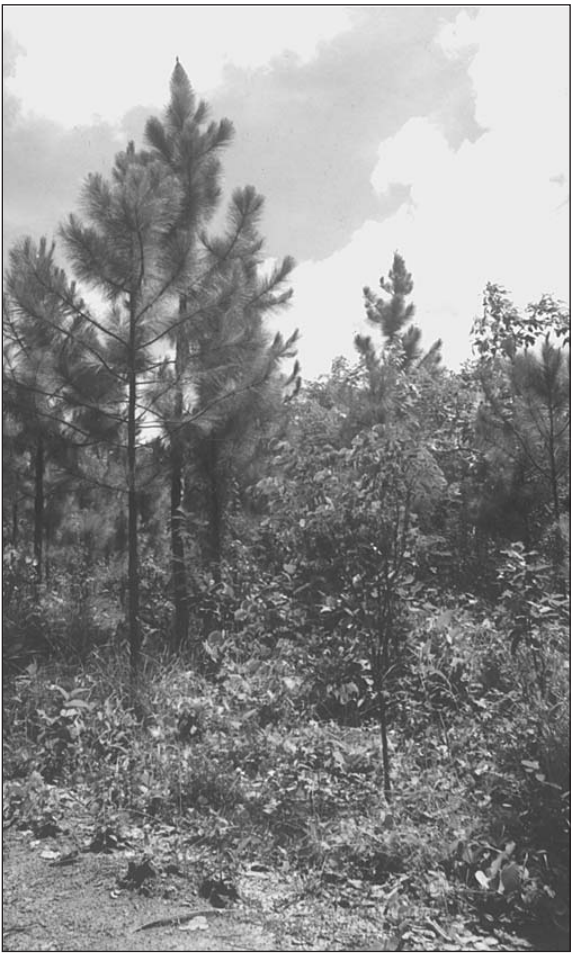

গ্রিন হাউজ অর্গানিক ফার্মস লিমিটেড এবং ওরিয়ন মাশরুম লিমিটেড নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ২৩ একর জমি দখল করার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তারা ১২ হাজার গাছ কেটে ফেলে...

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

অন্যের সম্পত্তি দখল করে নেয়া এখন আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে যেভাবে পারছে জমি, সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। দখলের ক্ষেত্রে সরকারি জমি দখলে নেয়া সবচেয়ে সহজ। আর তাই দখল হচ্ছে রেলওয়ের জমি, বন বিভাগের জমি, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমি। দখলের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় গত ১৫ জুন অবৈধ দখল হয়ে গেল ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ২৩ একর জমি। গ্রিন হাউজ অর্গানিক ফার্মস লিমিটেড এবং ওরিয়ন মাশরুম লিমিটেড নামক দুটি কোম্পানি এই জমি দখল করে নেয়।

দখলের কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠান দুটি ১৫ জুন ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক এলাকার এই জায়গাটিতে দু'টি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় বন বিভাগের লোকজন সেদিন বিকেলে সাইনবোর্ড দুটি নিয়ে আসে। এর পরদিন প্রতিষ্ঠান দুটি প্রায় দেড়শ' স্থানীয় মাস্তান প্রকৃতির লোক এনে জায়গাটিতে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া শুরু করে এবং পুনরায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। সে রাতেই শুরু হয় গাছ কাটা। স্থানীয় লোকজনের কাছে জানা যায়, ১৬ জুন রাত এবং ১৭ জুন দিনের মধ্যে তারা ১২ হাজার গাছ কেটে ফেলে।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের এসিএফ জিএম কবির সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '১৬ জুন আমরা থানায় জিডি করি। সেদিনই হোতাপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ক্যাম্প ইনচার্জ স্পটে গিয়ে আমাদের এবং ওদের কার্যক্রম বন্ধ করার কথা বলেন। আমরা তখন চুপ থাকি কিন্তু সে রাতেই তারা গাছ কেটে বেড়া দিয়ে ফেলে।'

বন বিভাগের সূত্রে জানা যায়, ন্যাশনাল পার্কের এই অংশটুকু কিছুদিন আগে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় এখানে ২৫ লাখ টাকার ঔষধি গাছ লাগানো হয়। ঘটনার রাতে ঔষধি গাছের সবগুলো চারা তুলে ফেলা হয়।

জানা যায়, গাজীপুর ডিসি অফিস থেকে এই কোম্পানি দুটি লিজের মাধ্যমে জায়গাটি অধিগ্রহণ করে। ন্যাশনাল পার্কের এই অংশটি একদিকে ডিসির খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে তা আবার সরকারি গেজেট অনুযায়ী বন বিভাগের অধীন। কিন্তু নিয়মানুযায়ী, বন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা না করে ডিসি অফিস কখনই একা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই জমি লিজ দিতে পারে না। তাছাড়া ১৯৯০ সালের সরকারি এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত এলাকায় ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, কলকারখানা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, দুগ্ধ ও মৎস্য খামার স্থাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি

করা হয়। কিন্তু সব নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গাজীপুর ডিসি অফিস বন বিভাগের এই জায়গাটিকে প্রতিষ্ঠান দুটির কাছে লিজ দিয়ে দেয়।

দখলকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করেছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি গুলশান ও তেজগাঁও এলাকায় ঠিকানা অনুযায়ী ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করে ঐ নামের কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পায়নি। গাজীপুরের মাস্টার বাড়ি এলাকার স্থানীয় লোকজন জানায়, এই জমি দখলে তারেক জিয়া সরাসরি জড়িত রয়েছেন। তাই তারা মনে করে, বন বিভাগ কখনই এই জমি ফিরে পাবে না।

বাংলাদেশে বনভূমি দখল প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজীপুর জেলার শালবন বনাঞ্চল। এই বনভূমি এলাকাটি রাজধানীর খুব কাছে হওয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কাছে এই ভূমি খুবই প্রিয়। তাছাড়া বনাঞ্চলটির ভূমিরূপ সমতল হওয়ায় এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে বেশি খরচ হয় না। আর তাই এই বনভূমির ওপর ব্যবসায়ীদের নজর খুব বেশি। তাছাড়া ভাওয়াল এলাকার এই বনাঞ্চল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে আইনি জটিলতা। জমিদারি শাসনামলে এই বনভূমির সবটুকুই ছিলো জমিদারদের। ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর মিলিয়ে মাত্র ৩৩৩ একর জমি ছিলো রিজার্ভ ফরেস্ট। বাকি সবটুকুই ছিলো জমিদারদের। জমিদাররা এই বনে তাদের গরিব প্রজাদের থাকতে দিতো। তারা সেখানে গাছপালা কেটে জমি চাষ করতো। দিনে দিনে তাদের পরিবার বড় হতে লাগলো, বনভূমি কাটার পরিমাণও বৃদ্ধি পেলো। এ অবস্থায় ফরেস্ট অ্যাক্ট ১৯২৭ ঘোষণা করা হলো। এই অ্যাক্টে বলা হলো, বনভূমির সবটুকুই জমিদাররা সরকারকে দিয়ে দেবে এবং সরকার তা তদারকি করবে। বছরে যা আয় হবে তা থেকে তদারকি খরচ হিসেবে সরকার ৬ ভাগ পাবে, বাকি ৯৪ ভাগ টাকা জমিদারদের দিয়ে দিতে হবে। ১৯৫০ সালে এই বনের নতুন আইন হলো। স্টেট এক্যুজিশন অ্যাক্ট ১৯৫০-এ ঘোষণা করা হলো ১০০ বিঘার বেশি কেউ জমি রাখতে পারবে না। বাকি অংশ সরকারকে দিয়ে দিতে হবে এবং এর দায়িত্বে থাকবে ডিসি অফিস। কৃষি জমি গরিবদের কাছে দেয়া হলো আর বনভূমির দায়িত্ব দেয়া হলো বন বিভাগকে। তখন বন বিভাগকে যে জমি দেয়া হলো তা একটানা জমি নয়। বন বিভাগের জমির মাঝে প্রচুর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি রয়ে গেলো। কতটুকু জমি বন বিভাগের তার সম্পূর্ণ হিসাব ডিসি অফিসে থাকা সত্ত্বেও জমিদারদের নায়েব ও তাদের আত্মীয়-স্বজন ভুয়া দলিল তৈরি করে বনাঞ্চল দখল করা শুরু করলো। অনেক ক্ষেত্রে তারা বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা পেলো। দখল হতে লাগলো বিশাল বনাঞ্চল।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ২ বছর আগের এক জরিপ অনুযায়ী গাজীপুর জেলার বন বিভাগের ১২ হাজার একর জমি অবৈধ দখল হয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সরকার ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান এলাকাটিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বন আইন অনুযায়ী এই এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সব শর্ত এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ২০ ধারা পর্যন্ত গেজেট হলে এই বন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিণত হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত ৬ ধারা পূরণ করা হয়েছে। উদ্যানের ভেতর যেসব ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি রয়েছে তা বন বিভাগ এক্যুয়ার করে নেবে। ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যানেও তা রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ৪৫০ একর জমির মধ্যে মাত্র ৬০ একর জমি এক্যুয়ার করা হয়েছে।

ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কের অভ্যন্তর বর্তমানে ছিনতাইকারী ও মাস্তানদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। পার্কের চারপাশে কোনো বাউন্ডারি না থাকায় আশপাশের লোকজন যখন তখন পার্কের ভেতরে প্রবেশ করে। নির্জন জায়গায় লোকজন পেলে এরা গয়নাগাটি, টাকা পয়সা ছিনতাই করে নেয়। মেয়েদের জন্য পরিবেশ আরো অসহনীয়। বেড়াতে আসা মেয়েদের প্রায় সব সময় মুখোমুখি হতে হয় বাজে টিজিংয়ের। পার্কের ভেতর মেয়েদের লাঞ্ছিত হবার ঘটনাও ঘটেছে কয়েকবার। এ বিষয়ে ঢাকা বন বিভাগের ডিএফও মোঃ আকবর হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গলের দিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এই উদ্যানের মধ্যে ব্যক্তিমালিকানায় জমি রয়েছে। তাই আমরা বাউন্ডারি দিতে পারছি না। আর তাই যখন তখন লোকজন ঢুকে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে।'

বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীদের রয়েছে নানা অভিযোগ। স্থানীয় যুবক মামুন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'উদ্যানের ভেতর যে সব কটেজ রয়েছে তা দিনের বেলায় দর্শনার্থীদের কাছে ভাড়া দেয়া হয়। আর রাতের বেলায় চলে অবৈধ ব্যবসা।' ন্যাশনাল পার্কের ভেতর ৪টি ভিআইপি এবং ২টি সাধারণ মানের রেস্ট হাউজ রয়েছে। এসব রেস্ট হাউজগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ভাড়া দেয়ার নিয়ম রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, কটেজের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের যোগসাজশে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন এবং ঢাকা থেকে যাওয়া মন্ত্রী, এমপির সন্তানেরা পতিতা নিয়ে এসব কটেজে রাত কাটায়। রাতভর কটেজে চলে দেহ ব্যবসা। এ সমস্যা নিয়ে স্থানীয় লোকজন বন বিভাগের ওপর ক্ষেপে রয়েছে। মামুন ২০০০কে বলেন, 'এই ফরেস্ট আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছে। বনের প্রয়োজন নেই বরং এখানে মিল ফ্যাক্টরি হলে আমাদের চাকরি হবে।'

ন্যাশনাল পার্কের অভ্যন্তরে একটি মিনি চিড়িয়াখানা রয়েছে। চিড়িয়াখানার ভেতরে প্রায় ২০/২৫টি হরিণ অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে। একমাত্র মদনটাকটি সঙ্গীহীন অবস্থায় সারাদিন ঝিমোয়। দুটি ময়ূর রয়েছে এই চিড়িয়াখানায়। ময়ূর দুটির জন্য বাসস্থানের জায়গা একেবারেই অপ্রতুল।

মিনি চিড়িয়াখানার পাশে রয়েছে কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র। এই খামারে রয়েছে একটি পুকুর কিন্তু এই প্রজনন খামারের কচ্ছপ নিয়ে কি করা হয় তা কেউ বলতে পারে না।

ন্যাশনাল পার্কের জায়গা দখল বিষয়টি নিয়ে এখন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে বন, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মিটিং হয়েছে। বাংলাদেশের বনভূমি দখলের পর এ যেন এক ধারাবাহিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখলের পর স্থানীয় বন কর্মকর্তারা স্থানীয় থানায় একটি মামলা করে। কখনোবা বন কর্মকর্তারাই দখল প্রক্রিয়ার নেপথ্যে থাকেন। আয় করে নেয় মোটা অংশের টাকা। মামলাটি থাকে লোক দেখানো মাত্র। পরবর্তীতে তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি মিটিংও হয়। এরপর সব শেষ। মামলা ঝুলে থাকে বছরের পর বছর। দখলদার স্থানীয় থানায় টাকা পয়সা দিয়ে ঐ জমির ওপর তার লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করে। ন্যাশনাল পার্কের জমির অবৈধ দখল এভাবেই হয়তো একদিন বৈধতা পেয়ে যাবে।

ছবি : **খালেদ সরকার**